মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন - জীবন চৌধুরী

আটকে পড়া পাকিস্তানি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয়ের পর এরা আটকে পড়ে। সংখ্যায় এখন তিন লাখের বেশি। বিস্ময় জাগে মনে- ৩৩ বছরেও সেই পুরনো সমস্যার সমাধান হলো না অথচ ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে কত কী চুক্তির বাস্তবায়ন হয়ে গেলো। কেন হয়নি পুরনো সমস্যার কোনও নিষ্পত্তি? এই ৩৩ বছরে কত সরকার এলো আর গেলো, কী হলো এদের প্রত্যাবাসনে? বলতে কি, কিছুই না। অথচ এদেরকে পুষতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের খরচের মেলাই ধাক্কা। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, আটকে পড়া পাকিস্তানিদের (বিহারী) জন্য নগদ ও খাদ্য সাহায্য বাবদ প্রায় ১০ কোটি টাকা ফি.বছর সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে খরচ করতে হচ্ছে। দেশের ৫৭টি আশ্রয় শিবিরে ১ লাখ ৬৫ হাজার ১শ’ ৭৮ জন বিহারী এই সাহায্য পেয়ে থাকে। বাকিরা এটা.সেটা করে কোনওভাবে চলছে। এদের মধ্যে অসামাজিক কাজে লিপ্ত রয়েছে এমন লোকের সংখ্যাও নেহায়েৎ কম নয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ অন্তহীন। মূলত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আটকে পড়া পাকিস্তানিদের বাস্তব অবস্থা তলিয়ে দেখা হয় তাহলে বলতেই হবে যে, পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার মানবিক ও নৈতিক- এই উভয় অধিকারই তাদের আগেও ছিল, এখনও আছে। দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে এরা যেভাবে দিন কাটাচ্ছে তাতে এদেরকে সাধারণত হতাশায় গ্রাস করাই স্বাভাবিক। সেই সত্তরের দশকে যারা পাকিস্তান যেতে চেয়েছিল, তারা অনেকেই এখন বাবা.মা হয়েছে, কারও কারও নাতি.পুতিও হয়ে গেছে। সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে বাংলাদেশের সামাজিক.অর্থনৈতিক সমস্যা। এই পাকিস্তানিরা দেশে যেতে কী না করেছে? মিছিল করেছে, মিটিং করেছে। পাকিস্তানের মন্ত্রী.মিনিস্টার এলে কালো পতাকা দেখিয়েছে। কাকুতি.মিনতি করেছে। আত্মাহুতির মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে কিন্তু পাক.সরকার এদের নিলো কই? খুব অল্প সংখ্যকই ভাগ্যগুণে যেতে পেরেছে নিজের দেশে। সিংহভাগ পড়ে আছে বাংলার মাটিতে নির্লজ্জ.বেহায়ার মতো। বাংলাদেশ গরিব দেশ। এই দেশের সরকার এদের আর টানবে কতোদিন, কতকাল? ১৯৭৩ সালে মুজিব.ভুট্টো চুক্তি অনুযায়ী আটকে পড়া পাকিস্তানিদের সেই কবে ফিরে যাওয়ার কথা অথচ আজও তারা বাংলাদেশে বহাল তবিয়তে। বঙ্গবন্ধুর আমলে পাকিস্তানি নাগরিক বিহারীদের প্রত্যাগমন শুরু হয়েছিল। সেই আমলে লক্ষাধিক পাকিস্তানি পাকিস্তানে যেতে পেরেছিল কি যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় ১৯৭৯ সালে পাকিস্তানে পাঠাতে সরকার সক্ষম হয়েছিল মাত্র ৪ হাজারের মতো বিহারীকে। তারপর ১৯৮৫ সালে পাক.প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বিহারীদের পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে দ্রুত পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই উদ্দেশ্যে সংগঠন রাবেতা.আল.ইসলামীর সঙ্গে মিলে পাকিস্তানে গঠন করা হয় রাবেতা ট্রাস্ট। কথা ছিল, ওই ট্রাস্ট সব বিহারীকে পাকিস্তানে পার করবে কিন্তু জিয়াউল হকের আকস্মিক মৃত্যুর পর সে উদ্যোগেও ভাটা পড়ে। বেনজীর ভুট্টো ক্ষমতায় এলেন। একবার বাংলাদেশ সফরে এসে উল্টা.পাল্টা কথা বলতে শুরু করেন। তিনি আটকে পড়া পাকিস্তানিদেরকে পাক.নাগরিক বলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, সুতরাং কী এমন দায় পড়েছে পাকিস্তানের যে এদের ফিরিয়ে নেবে? ফলে যা হওয়ার তাই হলো। বাংলাদেশ সরকারের তখনকার মতো আন্তরিক প্রচেষ্টা গেলো ভেস্তে। এরপর নওয়াজ শরিফ পাক.প্রধানমন্ত্রী হলে বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বেগম খালেদা জিয়া তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। দুই প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক আলোচনার খবর ফলাও করে প্রকাশ পেয়েছিল খবরের কাগজে পাকিস্তানি প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে। যৌথ ঘোষণায় বলা হয়- রাবেতা ট্রাস্টি বোর্ডের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফিরিয়ে নিয়ে পাঞ্জাবের ৩২টি জেলায় পুনর্বাসন করা হবে। কিন্তু ঘোষণার গর্জনে বর্ষণ তেমন কিছুই হয়নি। ১৯৯৩ সালের ১০ জানুয়ারি আটকে পড়া পাকিস্তানিদের মাত্র ৬৩টি

পরিবারের ৩৫২ জনকে পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল। মূলত প্রত্যাবাসন কাজ এ পর্যন্তই। তেমন আর অগ্রগতি নেই বিগত ১১ বছরে। তবে বিশেষভাবে যে কথাটি জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা যায় তা হলো, বাংলাদেশে আটকে পড়া বিহারীরা পাকিস্তানি নয় বলে বেনজীর ভুট্টোর বক্তব্য যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল। ধিক্কার দিয়েছিল বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ পাক.প্রধানমন্ত্রী বেনজীরকে। অথচ পরবর্তী পর্যায়ে বেনজীর ভুট্টোর বক্তব্য সরকারিভাবে খণ্ডন করেছে পাক.সরকারই। ২০০২ সালের ১৩ জুন পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, বিহারীদের বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা সরকারের দায়িত্ব- পাক.স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দৈনিক 'কাবিশ' পত্রিকা এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঈনুদ্দিন হায়দারের উদ্ধৃতি দিয়েছে এভাবে যে- '১৯৭১ সালে ঢাকার পতনের সময় যারা সাবেক পূর্ব.পাকিস্তানে বিহারী হিসেবে বসবাস করছিল তারা সবাই পাকিস্তানের নাগরিক। এদেরকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনা পাক.সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। অর্থাৎ পাকিস্তানি প্রত্যাবাসনে অহেতুক ধূম্রজাল বিস্তারের কোনও অবকাশ নেই। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এখানে বসবাসরত অবাঙালিদের নিজেদের পছন্দমতো অপশন দেওয়ার আহবান জানানো হয়েছিল। এর মূল বিষয় ছিল- তারা হয় বাংলাদেশে থাকবে নয়তো পাকিস্তানে চলে যাবে। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বাংলাদেশের পক্ষে অপশন দিয়ে এদেশের নাগরিক হিসেবে থেকে যায়। তবে অধিকাংশই পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যেতে মত প্রকাশ করে। খুব সামান্যই গেছে পাকিস্তানে। বিশাল অংশটি বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থান করছে গাদাগাদি অবস্থায়। জীর্ণ পুরাতন ভবন। কখন যে ধসে যায় বলা যায় না। ক্যাম্প.ভবনগুলোর পরিবেশ বিপন্ন, বিপর্যস্ত। এইসব আটকে পড়া পাকিস্তানিদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থ খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ, তিনগুণ। সরকারি এক পুরনো হিসাব মতে, ১৯৭২ সালের প্রায় শুরু থেকে ১৯৮৭ সালের জুন পর্যন্ত পাকিস্তানিদের জন্য শিবির তৈরি, মেরামত, প্রত্যাবাসন ব্যয়, বিদ্যুৎ, পানির বিল, খয়রাতি গম, গম.পরিবহন ইত্যাদি খাতে খরচ হয়েছে ১৭৭ কোটি টাকা। এদের জন্য বাংলাদেশের এত টাকার শ্রাদ্ধ হবে কেন? যাদের চিন্তা.চেতনায় পাক.প্রীতি তাদেরকে কি বিদায় করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়? উল্লেখ্য, আটকে পড়া পাকিস্তানিদের বসবাসের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হচ্ছে- মোহাম্মদপুরস্থ জেনেভা ক্যাম্প, হাজারীবাগ, জিগাতলা, মিরপুর, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, ঈশ্বরদী, শান্তাহার প্রভৃতি জেলা.উপজেলা। এরা কোন অবস্থায় কী করছে তা কারও আজ আর অজানা নয়। অসামাজিক কাজ, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, পতিতাবৃত্তির মতো ঘৃণ্যতম অপরাধের সঙ্গেও এদের কেউ কেউ জড়িত। জড়িত চোরাচালানের সঙ্গে, জাল নোটের ব্যবসায়। সংঘবদ্ধ হয়েও দুস্কর্ম করে যাচ্ছে, যার দরুণ সামাজিক পরিবেশও বিঘ্নিত অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি। এইসব ভিনদেশি মানুষকে পুষে রাখার অর্থ দাঁড়ায় বাংলাদেশের সংকট.সমস্যাকে কেবল ঘোলাটে ও ঘনীভূত করা। তার চেয়েও বড় কথা- এইসব লোকদের মনে পাকিস্তানেরই স্বপ্ন লালিত। সুতরাং পাকিস্তানপ্রেমী এই জনগোষ্ঠীকে এদেশের পক্ষে লালন.পালন যেমন নীতি.বিরুদ্ধ ও কূটনৈতিক শালীনতার লঙ্ঘন, তেমনি পাকিস্তান সরকারের জন্য লজ্জাজনক এবং অমানবিক। এখন প্রশ্ন হলো, পাকিস্তানের সে লজ্জা থাকলে তো? আমরা ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করে থাকি, মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে ক্যাম্পে অবস্থানরত পাকিস্তানিরা পাক.পতাকা উঠানোর মতো দুঃসাহস করে, পোস্টার.ফ্যাস্টুনে ছেয়ে যায় চারপাশ। পাক.পতাকা নিয়ে ছোটখাটো মিছিলেরও খবর পাওয়া যায়। আমাদেরকে স্তম্ভিত করে, বিস্ময়ে ভাবতে হয়- বাংলাদেশের খেয়ে.পরে থাকা লোকগুলোর স্পর্ধা কত, রক্তে ভেজা বাংলার মাটিতে এমন সব অমার্জনীয় অপরাধ করতে এরা সাহস পায় কি করে? এদের কার্যকলাপ এখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। সুতরাং বাংলাদেশের ঘাড়ে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের যে দায় চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মতো, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যথায় দেশ ভারাক্রান্ত, সেই বাংলাদেশ সরকারেরই উচিত বিষয়টির সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য তথা ব্যথা সারানোর লক্ষ্যে

সর্বশক্তি নিয়োগ করা। এক্ষেত্রে পাক.সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখা, কৌশল প্রয়োগ এবং সর্বোপরি সার্কভুক্ত দেশ হিসেবে পাকিস্তান ছাড়া বাদ বাকি পাঁচটি দেশের সরকারের ওপর প্রচেষ্টা প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে পুরনো ব্যাধির নতুন করে সমাধান খুঁজে বের করার কূটনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কারণ, ৩৩ বছর ধরে পাক.সরকার নানা ছলছুতোয় প্রত্যাবাসনের বিষয়টিকে যেভাবে এড়িয়ে চলেছে তা নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক শালীনতা.বিরোধী, মানবাধিকার লজ্ঘন ও নীতি.বিবর্জিত। পাক.সরকার আটকে পড়া পাকিস্তানিদেরকে ফিরিয়ে নিতে যদি সচেষ্ট হতো তাহলে বিষয়টি আজ যে ৩৩ বছর ধরে ঝুলতো না সেটা আশা করি বোকারাও বুঝবে। আমাদের বুদ্ধিমান, অতি বিচক্ষণ, 'দেশ ও জনদরদী' সরকারের পক্ষে এই সোজা কথাটা না বোঝার কারণ আমরা খুঁজে পাই না। আমরা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে পাক.সরকারের নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেতে দেখে আসছি। আর তাই এ ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতি কৈফিয়ৎ তলব করা ও যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে যা পাকিস্তান সরকার মেনে নিতে বাধ্য। বাধ্য করতে হবে পাকিস্তানকে তার সব লোককে সত্বর ফিরিয়ে নিতে। আমরা সরকারের কঠোর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ আশা করছি প্রত্যাবাসন বিষয়ে।

জীবন চৌধুরী: সাংবাদিক, গীতিকার, লেখক, শিশু সংগঠক।